১ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা।

বৈশাখ, ১৩১৮।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী-পত্রিকা।

(আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসাসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

সম্পাদক

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী

ও

শ্রীহেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন কবীন্দ্র।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

ঢাকা শান্তি প্রেসে,—শ্রীবিরাজমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী-পত্রিকা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"

১ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩১৮ { প্রথম সংখ্যা।

অবতরণিকা।

বিনা 'অবতরণিকা'য় সাহিত্যসংসারে সাধারণতঃ নূতন পুস্তক ও পত্রিকার অবতরণ নয়নগোচব হয় না। যে অবতরণিকা কাহারও মতে 'মাসিকে'র অবশ্যকর্ত্তব্য আভ্যুদয়িক, কাহারও মতে নবসাহিত্যের শুভশংসিনী নান্দী বা পূর্ব্বপীঠিকা, সেই অবতরণিকা কোন্ সময়ে কাহার কৃপায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তৎসম্পৃক্ত বিশ্বাস যোগ্য কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা সম্যক্ অবগত নহি। কোন-কোন-ও অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যিক বলেন,—কল্পনাগর্ভে বা মুদ্রাযন্ত্রের সূতিকাগৃহে যখন সাহিত্য-শিশু অবস্থিতি করে, তখন সম্পাদকরূপী বিধাতৃ-পুরুষ উহার ললাট-দেশে যে আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যাদির কথা লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই নাম অবতরণিকা। ভূমিকা 'মুখবন্ধ' 'নিবেদন' ও 'আমাদের কথা' প্রভৃতি সেই অবতরণিকারই রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। এই 'অবতরণিকা' বা ললাটলিপি পাঠ করিলেই নবজাত মাসিক শিশুর নাম গোত্র ও জীবনের উদ্দেশ্যাদি পরিজ্ঞাত

হওয়া যায়। [illegible] কারণেই সম্ভবতঃ সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অবতরণিকার সমাদর সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীভগবানের কৃপায় আমরাও আজি একখানি মাসিক পত্রিকার ললাটলিপি-লিখনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

এখন কথা—কি লিখি? 'আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিণীর' অনন্ত অফুরন্ত প্রয়োজনের কথা নানাছন্দে লিখিতে পারি; কিন্তু পড়িবে কে? আমাদের শত শপথে কাহারও বিশ্বাস-পথ পরিষ্কৃত হইবে কি? যদি আমাদের সহস্র সরল সরস কথা ইহার অস্তিত্বে কাহার-ও আস্থা জন্মাইতে না পারে, তবে আর এই দারুণ বিড়ম্বনায় এত আড়ম্বর কেন?

এখন প্রশ্ন এই, বিবিধ "মাসিক"-বীচিবিকম্পিত বাঙ্গালা-সাহিত্যসাগরবক্ষে আবার নূতন বুদ্বুদের উদ্ভব কেন? জ্ঞানগৌরবদীপ্ত বর্ত্তমান যুগে ক্ষণস্থায়ি মাসিকের সৃষ্টি দ্বারা জগতের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করার প্রয়োজনইবা কি?

ইহার উত্তরে আমরা নিশ্চয়ই পরাজয় স্বীকার করিব না। জগতে জন্ম-মৃত্যু কাহারও স্বেচ্ছাধীন নহে, নিষ্প্রয়োজনও নহে। জাগতিক নিয়মে উদ্ভূত ও বিলীন মাসিক পত্রিকার জন্মমৃত্যুর নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষ কখনই দায়ী হইতে পারে না; সুতরাং আমরা নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ,—কোনরূপ কঠিন কৈফিয়তের জালে জড়িত নহি।

আমরা 'নিরঙ্কুশ, বলিয়া যে কোনরূপ রীতি-নীতির অধীন নহি, তাহা নহে। 'অবতরণিকায়' নবজাত পত্র-পুস্তকাদির জন্ম-প্রয়োজন-প্রকাশের যে চিরন্তনী রীতি পরিলক্ষিত হয়, আমরা তাহার সম্মান রক্ষা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না। "আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিণী"র জন্ম-প্রয়োজন কি লিখিব? নামেই ইহার উৎপত্তি-উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নষ্টোদ্ধার ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিণী-পত্রিকা-প্রচারের প্রধানতম উদ্দেশ্য। স্থানীয় কবিরাজমণ্ডলীর আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার পুনরুদ্ধার উদ্দেশ্যে 'আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ৬।৭ বৎসর যাবৎ এই সভা যথাশক্তি উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে।

ইহার পরিচালনভার কৃতী ব্যক্তিগণের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এই আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী সভার উদ্যোগে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হইল ; সুতরাং এই পত্রিকা সম্মিলিত কবিরাজমণ্ডলীর স্বত্বাস্পদীভূত সামগ্রী, ইহা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব নহে। এই পত্রিকার লাভালাভে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা-ব্যবসায়িমাত্রই লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক যিনি যেখানে আছেন, আমরা তাঁহাকেই অশেষ শ্রদ্ধার সহিত সবহুমান আমন্ত্রণ জানাইতেছি,—আপনারা সকলেই এই পত্রিকাখানিকে নিজস্ব বিবেচনা করিয়া ইহার উৎকর্ষসাধনে যথাশক্তি চেষ্টা করুন। সমবেত সাধনায় আমাদের সিদ্ধিলাভ অবশ্যই ঘটিবে। উপসংহারে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভিষককুলশিরোমণি স্বনামধন্য লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের অসামান্য আনুকূল্য আমাদিগকে এই কঠোর কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত দেশমান্য মহামহোপাধ্যায় মহোদয়ের উৎসাহবাণীতেই আমাদের অলস অবশ হৃদয়ে কর্ম্মশক্তির একটা নব প্রণোদনা জগিয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহারই সহানুভূতি ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া, বিশ্ববিধাতার বিশ্বজনীন আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উৎকর্ষবিধায়ক পত্রিকা সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইলাম।

এস্থলে ভয়ে ভয়ে আর একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি,—যে জল বায়ুতে বান্ধবের চির-বান্ধব যোটে নাই, বঙ্গদর্শনের ভাগ্যেও দীর্ঘ-দর্শন-দান ঘটে নাই, সেই জল বায়ুতে' আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী'র অদৃষ্টেও যে অস্পৃহণীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে না, এই কথা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি না। আমাদের সহৃদয় বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণীর দ্বারে সেই অবাঞ্ছনীয় শেষ দশা যেন কখনও উপনীত না হয়, ইহাই শ্রীভবানের শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসা।

অস্ত্র-ক্রিয়াটা পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানরূপ মহাতরুর অমৃতময় ফল বলিয়াই অনেকের ধারণা। কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসার বহুল প্রচারে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, মূত্রপরীক্ষা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতত্ত্বসমূহ প্রাচীন য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণেরই মস্তিষ্কপ্রসূত বলিতেও অনেকে কুণ্ঠিত নহেন। বহু দূরদর্শী ব্যক্তি বিশেষ গবেষণায় এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারিয়াছেন যে, শুধু অস্ত্রচিকিৎসাদি কেন, আভ্যন্তরিক রোগনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অসম্পূর্ণতার পক্ষেও এই সকল যুক্তি অকাট্য। বৈদেশিক ইতিহাস পাঠে যাহারা ভারততত্ত্বজ্ঞ, অনুকরণপ্রিয়তা যাহাদের মজ্জাগত, তাহাদের এই সকল উক্তি বিস্ময়কর নহে। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সহিত যাঁহাদের সামান্যরূপও সম্পর্ক সংস্থাপিত রহিয়াছে, দেশের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে অবশ্যই তাঁহারা সমর্থ। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনা করিলে বিদিত হওয়া যায় যে, যখন রত্নপ্রসূ ভারতভূমিতে ইংরেজগণ পদার্পণ করেন নাই, কিংবা ভারতগগণে যখন মোগল পাঠানের বিজয়-পতাকা উচ্ছ্রিত হয় নাই, তাহারও বহুশতাব্দী পূর্ব্বে * সুশ্রুত হারীত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে অস্ত্রচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতির বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহা বলিলে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যভিষক্-সম্প্রদায় অস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতির যেরূপ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, আধুনিক বিদেশীয় চিকিৎকগণ তাঁহাদের মতেরই পুষ্টিসাধন করিতেছেন মাত্র। বহু পরীক্ষা গবেষণা দ্বারা অস্ত্রবিৎ ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ দিন দিন অস্ত্র-

* বিদেশীয় ডাঃ ওয়াইজ বলেন, "অতি পূর্ব্বকালে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় হইতে নবম কি দশম শতাব্দীর মধ্যে চরক সুশ্রুতাদির গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।"

* রিভিউ অফ দি হিষ্টরী অব মেডিসিন, ১ম ভাগ ৩৯ :পৃ।

চিকিৎসার যে সকল নুতন তত্ত্ব ও অস্ত্র যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিতেছেন; বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের সূক্ষ্মদর্শী ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসকগণ তৎসমস্তই আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন ;* বিশেষতঃ তাঁহারা অস্ত্র যন্ত্রাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমরা অন্ধবিশ্বাসে বা বিদ্বেষ-বুদ্ধির সাহায্যে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কোন বিষয়েরই অবতারণা করিব না ; আমরা তুলনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদির আকৃতি প্রকৃতি ও প্রয়োগ প্রণালীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিতে পাই, যথাস্থানে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব। কেবল প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে আমরা দিকমাত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইব।

যন্ত্রের শ্রেণী, সংখ্যা ও গঠন প্রণালী।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অস্ত্র সাধারণতঃ যন্ত্র ও শস্ত্ররূপে দুইভাগে বিভক্ত*। শরীরস্থ শল্য † সকল উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে। যন্ত্র সকল স্থূলতঃ ছয় প্রকার :—স্বস্তিক যন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র ‡। সূক্ষ্মরূপে আবার এক একটীতে বহুবিধ ভেদদৃষ্টি হয় §। যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট লৌহাভাবে লৌহের ন্যায় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যান্তর দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে। যন্ত্র

* উদারচেতা ডাঃ ওয়াইজ বলেন "অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অবস্থান, প্রকৃতি এবং শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে সার্জ্জনদিগের জ্ঞান লাভ করা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন" ডাঃ ওয়াইজ কৃত রিভিউ অব দি হিষ্টরী অব মেডিসিন, ৩২৫ পৃঃ ১ম ভাগ।

* আয়ুর্ব্বেদে যন্ত্র ও শস্ত্র যদিও ভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সাদৃশ্য হেতু আমরা এক স্থলেই ইহা সন্নিবেশিত করিলাম।

†শরীর ও মনের কষ্টদায়ক দ্রব্য সমূহকে শল্য কহে, কিন্তু এই স্থলে শরীরের কষ্টদায়ক পদার্থকেই বুঝাইতেছে, যথা—কাচ কণ্টক প্রভৃতি। সুশ্রুত ৭ম অঃ ৩য় শ্লোক (সূত্রস্থান)।

‡ সুশ্রুত ৭ম অঃ ৪ শ্লোক (সূত্র স্থান)।

§ স্বস্তিক যন্ত্র ২৪, সন্দংশ যন্ত্র ২, তাল২, নাড়ীযন্ত্র ২০, শলাকা ১৮, উপযন্ত্র ২৫শ প্রকার।

গুলির অগ্রভাগ সিংহাদি পশু ও কাক প্রভৃতি পক্ষীর মুখাবয়বের ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে এবং ছাত্রদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে সাদৃশ্য হেতু তৎ তৎ পশু পক্ষীর নামেই অভিহিত হইয়াছে ¶।

যন্ত্র-সমূহ সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও প্রয়োজন ভেদে খর-মসৃণ-মুখ হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে সুদৃশ্য সুদৃঢ় ও অনায়াসে গ্রহণযোগ্য হয়, তদ্‌বিষয়ে মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ॥

স্বস্তিক্ জাতীয় যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ প্রণালী।

স্বস্তিক জাতীয় যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ১৭ অঙ্গুলী পরিমিত। এই যন্ত্রগুলি পশু পক্ষীর মুখের ন্যায় রচিত হইয়া থাকে। *

এই যন্ত্র দুইখানি পৃথক্ লৌহখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত এবং ঐ লৌহখণ্ডদ্বয় একটী ক্ষুদ্রাকৃতি কীলকের দ্বারা সংযোজিত থাকে, মূলদেশ কিঞ্চিৎ নত হওয়া উচিত। অস্থির মধ্যে শল্য প্রবিষ্ট হইলে তদুদ্ধরণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। †

সন্দংশ যন্ত্র।—এই যন্ত্র দ্বিবিধ; কর্ম্মকারের শাঁড়াশীর ন্যায় একটি কীলকযোগে গঠিত; দ্বিতীয় চিমটার মত, কীলকযুক্ত নহে ‡, উভয়েই ষোল অঙ্গুলী পরিমিত; ত্বক মাংস শিরা স্নায়ুগত কণ্টকাদি শল্যোদ্ধার করাই ইহাদের কার্য্য।

তাল যন্ত্র।—ইহাও দুই প্রকার, এবং মৎস্য শল্কের ন্যায় পাতলা মুখবিশিষ্ট,

---

¶ অষ্টাঙ্গহৃদয়, সূত্রস্থান ২৫ অধ্যায় ৫ম শ্লোক, নাম যথা—সিংহাস্য কাকাস্য প্রভৃতি

॥ ৭ম অঃ, ৫ শ্লোক সূত্রস্থান, সুশ্রুত।

* পশুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে, তরক্ষু, ভল্লুক, চিতাবাঘ, বিড়াল, শৃগাল, হরিণ ও এবারুক (হরিণের ন্যায় জন্তুবিশেষ)। পক্ষীর মধ্যে কাক, পেঁচা, চিল, বাজ, বক প্রভৃতি ২৪টীর মুখের ন্যায় রচিত হয়। সুশ্রুত ৭ম অঃ সূত্র স্থান।

† অষ্টাঙ্গহৃদয় ২৫ অঃ ৭ম শ্লোক সূত্রস্থান। এই দেশীয় স্বস্তিক যন্ত্র যেমন বিভিন্নরূপে রচিত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, ডাক্তারিমতেও তদ্রূপ নানা প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাক্তারিতে সাধারণতঃ ইহাদিগকে Bone forceps বলে।

‡ সুশ্রুত, সূত্র ৭ম অঃ। আয়ুর্ব্বেদে ইহা দ্বিবিধ। ডাক্তারিমতে ইহা বহু প্রকার—উভয় মতেই কার্য্যতঃ বড় একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ডাক্তারি নাম ফর্সেপ্‌স্ (forceps)

অপরটী পূর্ব্বোক্তটীর ন্যায় বিমুখযুক্ত। এই যন্ত্র নাসা-কর্ণাদি-প্রবিষ্ট শল্য বহিষ্করণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় §।

নাড়ী যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগপ্রণালী।

নাড়ী যন্ত্র বহু প্রকার, গঠন বিশেষে কর্ণ-বিবরস্থ শল্যোদ্ধার ও অর্শ ভগন্দর প্রভৃতি রোগ পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হয়।*

শলাকাযন্ত্রের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী।

শলাকাযন্ত্র কার্য্যভেদে নানা প্রকার গঠিত হয়। শোষাদির গতি নিরূপণ, শল্যাদির উর্দ্ধোত্তলন এই যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। প্রয়োজন বিশেষে ইহা গণ্ডূপদ (কেঁচো) শরপুঙ্খা ও সর্প ফণাদির ন্যায় গঠিত হয়। †

সূক্ষ্মদর্শী সুশ্রুত যন্ত্রাদির ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য ভাবি-চিকিৎসকদিগকে সস্নেহ বচনে বলিয়া গিয়াছেন, "আমি যাহা বলিলাম, যন্ত্রাদি-চিকিৎসার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে যন্ত্রাদির গঠন ও কার্য্য প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিবেন।" †

যন্ত্র সম্বন্ধে একরূপ বলা হইল। § এখন শস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

---

§ অষ্টাঙ্গহৃদয় ২৫ অঃ ১০ শ্লোক (সূত্র) ডাক্তারি কবিরাজিতে কোন পার্থক্য নাই। ডাক্তারি মতে ইহাকে Ear forceps কহে।

* আয়ুর্ব্বেদের নাড়ী যন্ত্রের অন্তর্গত অর্শোযন্ত্র আর ডাক্তারি anal specular এক নয় কি ?

বস্তি যন্ত্র আর Enema syringe একই যন্ত্র।

† সুশ্রুত ৭ম অঃ সূত্র। আয়ুর্ব্বেদের শলাকা যন্ত্রের কার্য্য, ডাক্তারির probe দ্বারা সম্পাদিত হয়। শলাকা যন্ত্রের অন্তর্গত গর্ভ শঙ্কু ও যোগ্য শঙ্কু যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, ইয়ুরোপীয়দের (Crotchet Forceps) সেই কার্য্য সম্পাদন করে নাকি ?

অশ্মরী যন্ত্রের ডাক্তারি নাম Stone forceps, পাষাণ প্রভৃতি উপযন্ত্র। বিস্তৃতিভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

† সুশ্রুত ৭ম অঃ ১৪ শ্লোক (সূত্র)।

§ যন্ত্রের সংখ্যা ১০১ এবং যন্ত্রের দ্বাদশটী দোষ দৃষ্ট হয়, যথা,—অতিস্থূল, অসার, অতিদীর্ঘ, অতিক্ষুদ্র, অগ্রাহি, বক্র, শিথিল অত্যুন্নত, মৃদুকীলক মৃদুমুখ, মৃদুপার্শ্ব ও বিষমগ্রাহী।

শস্ত্রের সংখ্যা নির্ম্মাণ কৌশল, ও কার্য্যপ্রণালী।

শস্ত্র স্থূলতঃ বিংশতি প্রকার, যথা।* মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র † নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারিমুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকুর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী। এই শস্ত্রগুলিও যন্ত্রের ন্যায় উত্তম লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মণ্ডলাগ্র লেখন ছেদনাদি (আঁচড়ান, চেরা প্রভৃতি) কার্য্যে ও করপত্র অস্থির ছেদনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

বাহ্বট বলেন, মণ্ডলাগ্র অস্ত্রের ফলা তর্জ্জনীর ন্যায় স্থুল এবং অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, বৃদ্ধিপত্র ক্ষুরাকার শস্ত্র, ইহাও ছেদনাদিতে ব্যবহার্য্য। ‡

নরুণের ন্যায় নখ শস্ত্রের গঠন ও কার্য্য,—এই অস্ত্র দৈর্ঘ্যে ৯ অঙ্গুলি পরিমিত, বাহ্বটের মতে উৎপল পত্র ও অর্দ্ধধার-শস্ত্র দীর্ঘমুখ-বিশিষ্ট এবং ছেদন ভেদনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুশ্রুতের মুদ্রিকা শস্ত্রই সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ, হৃদয়ের "অঙ্গুলী-শস্ত্র"। ইহার মুখ একটি অঙ্গুরীয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত থাকে। ফলা অর্দ্ধ অঙ্গুল আয়ত; ইহার আকৃতি মণ্ডলাগ্র বা বৃদ্ধি পত্রের সমান। চিকিৎসকের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর অগ্র পর্ব্বের যে পরিমাণ, তদনুরূপ মুদ্রিকা উহাতে অর্পিত হইয়া থাকে; এই শস্ত্র সূত্রদ্বারা মণিবন্ধে বদ্ধ করিয়া গলস্রোতোগত ব্যাধির ছেদনাদিতে ব্যবহার করা যায়। সূচী, কুশপত্র, আটী মুখ, শরারি মুখ এবং ত্রিকুর্চ্চক নামক শস্ত্র দ্বারা পূযাদি বিস্রাবণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। সীবন (সেলাই) কার্য্যে তিন প্রকার সূচীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সূচীসমুদয় গোলাকার এবং ইহাদের সূতা দৃঢ় ও গূঢ়ভাবে থাকে (অর্থাৎ উঁচু হইয়া থাকে না)। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র গুপ্ত।

---

* বাহ্বটের মতে শস্ত্র সংখ্যা ষড়বিংশতি। উভয় মতেই এই সংখ্যা স্থূলতঃ লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ শস্ত্র বহুপ্রকার।

† বিদেশীয় চিকিৎসগণ নাড়ী ব্রণাদি ছেদনের জন্য Bistoary নামক যে অস্ত্র ব্যবহার করেন কবিরাজবর্গের বৃদ্ধিপত্র তদনুরূপ শস্ত্র।

‡ সুশ্রুত ৮ম অঃ। ছেদন ভেদনাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য আর্য্য চিকিৎসকগণ মণ্ডলাগ্র উৎপলপত্র প্রভৃতি শস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ডাক্তার মহাশয়েরাও Lancets ব্যবহার করিয়া থাকেন।

খাদ্যাখাদ্য বিচার।

সমস্ত মানবের খাদ্যাখাদ্য এক প্রকার নহে। জাতি দেশ বয়ঃপ্রকৃতি অবস্থাদিভেদে খাদ্যাখাদ্যেরও মূর্ত্তিভেদ পরিকল্পিত হইয়াছে। এক জাতির পবিত্র খাদ্য অন্যজাতি অপবিত্র বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দেশভেদে এবং অবস্থাদি ভেদেও খাদ্যখাদ্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়। তথাপি আমরা সমষ্টিতে যাহা বহুল মানবের দেহ মন ও স্বাস্থ্যের উপকারী, তাহাকে খাদ্য এবং যাহা তাহার বিপরীত তাহাকে অখাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এই হিসাবে খাদ্যরূপে পরিগণিত বস্তুর মধ্যেও ভিন্ন কারণে যে গুলি দেহ মনের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় তাহাকে বিরুদ্ধ বস্তু বলে।

এই বিরুদ্ধ বস্তু তিনপ্রকার, সংযোগ বিরুদ্ধ, দেশ বিরুদ্ধ ও কাল বিরুদ্ধ। যে সকল বস্তু পৃথক পৃথক অবস্থায় উপকারী কিন্তু পরস্পর মিলিত হইলে বিষের ন্যায় অপকারী হয়, তাহাদিগকে সংযোগ বিরুদ্ধ বলে। যথা—মধু ও ঘৃত পৃথক্ অবস্থায় উপকারী, সম পরিমাণে মিলিত হইলে বিষের ন্যায় অহিত। দুগ্ধ মৎস্যের সংযোগও ঐরূপ অনিষ্টকর। কতকগুলি বস্তু দেশ বিশেষে অপকারী, যথা—শীতপ্রধান দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য জনক চা, মদ্য, কাফি, মাংস, বসা প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অপকারী, এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্যবহার্য্য শীতল বস্তু শীতপ্রধান দেশে অপকারী। ইহাকে দেশ বিরুদ্ধ বলে।

কতকগুলি বস্তু সকল সময় অপকারী নহে, কিন্তু সময় বিশেষে অপকার করে। যথা শীতকালে উষ্ণ বস্তু ও গ্রীষ্মকালে শীতল বস্তু, এবং রাত্রিতে দধি ভোজন ও প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি ভোজন। ইহা দিগকে কাল বিরুদ্ধ বলে।

প্রাচীন আর্য্যগণ এই ত্রিবিধ বিরুদ্ধকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিতেন। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ও অনুকরণ প্রিয়তার প্রাবল্যে আজকাল অনেকেই শাস্ত্রের শাসন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাই নিরন্তরই বিরুদ্ধ বস্তুর ব্যবহার চলিতেছে। শীত প্রধান দেশের ব্যবহার্য্য বস্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়াছে। সংযোগ বিরুদ্ধ ও আজকাল বাদ পড়িতেছে

না। পুরাকালে আর্য্যগণ এতদূর সাবধান ছিলেন যে দুগ্ধ মৎস্যে সংযোগ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহারা মৎস্যের সহিত ঘৃত সংযোগ করিতেও বিরত থাকিতেন। আজকাল মৎস্যের সহিত ঘৃত সংযোগ ও দুগ্ধের সহিত কড্‌লিভার অয়েলের ব্যবহার তো চলেই, অধিকন্তু মৎস্যে দুগ্ধে প্যাজে রসুনে চিনি মশুায় একত্র মথিত হইয়া পাকপ্রণালী মতে এক এক অপূর্ব্ব সুধা সমুত্থিত হইতেছে, আর আমাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

কাল বিরুদ্ধ বস্তু একেবারেই সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে। রাত্রিতে দধি ভোজনে এবং প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি ভোজনে যে অপকার হয়, একথা এখন অনেকেই গাঁজাখোরী কথা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমাদের মহর্ষি দিগের বাগ্‌বিন্যাসের পদ্ধতিতেও হিতে বিপরীত হইয়াছে। যথা—"কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃস্যাৎ", "পূতিকাব্রহ্ম ঘাতিনী", ইত্যাদি ফল-শ্রুতিই আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। আমরা মনে করি, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভোজনে অর্থের হানি হয়, একি গাঁজাখোরী কথা! কুষ্মাণ্ড থাকিল পেটে আর অর্থ থাকিল লোহার সিন্ধুকে, পেটের কুষ্মাণ্ডে লোহার সিন্ধুকের টাকা উড়াইবে কিরূপে? সামান্য পুঁই শাক ভোজনেইবা ব্রহ্মবধের পাপ হইবে কিরূপে? অগ্রে আমরা এই কথাগুলি একটু বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, পরে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইবে।

তিথি নক্ষত্র গ্রহাদির সহিত পৃথিবীর অতি ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। চন্দ্র মণ্ডল বারিবহুলপদার্থ, উহার নিজের কোন আলোক নাই, রাশি চক্রের ও পৃথিবীর গতি অনুসারে সূর্য্যালোক চন্দ্র মণ্ডলের যতটুক অংশে যে দিন পতিত হয়, সেই দিন সেই অংশটুক আলোকিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব আমাদের বরাহ সংহিতায় বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। * উক্ত নিয়মে তিথি বিশেষে চন্দ্রের যতটুক অংশ যে দিন আলোকিত হয় তাহার আকর্ষণী শক্তিও সেই সেই দিনে তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

* সলিল ময়ে শশিনি রবে দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশংক্ষপয়ন্তি দর্পনোদয় নিহিতা ইব মন্দির স্যান্তঃ।

বরাহ সংহিতা

সুতরাং পৌর্ণ মাসি তিথিতে এবং পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে। উক্ত এই তিথিতে সমুদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছলিত হইয়া নদ, নদী, খাল, নালায় প্রবেশ করতঃ পৃথিবীর অনেকাংশ সিক্ত ও প্লাবিত করিয়া থাকে। যে যে স্থান সমুদ্রের বহু ব্যবধানে অবস্থিত অর্থাৎ যে যে স্থানে জোয়ার ভাটা হয় না সে সকল স্থানের জল ও কিছু কিছু উচ্ছূন হইয়া ধরণীর আর্দ্রতা ও অবস্থান্তর ঘটাইয়া থাকে। কেবল পূর্ণিমা অমাবস্যাতেই যে এইরূপ জলোচ্ছাস ও ধরণীর অবস্থান্তর হয়, তাহা নয়, চন্দ্রের পূর্ণতা অনুসারে প্রতি তিথিতেই অসমান ভাবে এইরূপ জলোচ্ছাস অর্থাৎ জোয়ার ভাটা ও পৃথিবীর অবস্থান্তর ঘটিতেছে। প্রত্যেক প্রাণীর শরীরই পাঞ্চ ভৌতিক, তন্মধ্যে ক্ষিতি ও জলের ভাগই প্রায় অধিক। জলের উচ্ছূনতায় ও পৃথিবীর অবস্থান্তরে পার্থিব শরীরেও তিথি বিশেষে পৃথিবীর ন্যায় অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই রোগীর শরীরে প্রত্যক্ষ ও আত্ম শরীরে অনুভব করিতেছেন। যাহাদের কাস, শ্বাস, আমবাত, শোথ প্রভৃতি জলীয় ধাতু জনিত রোগ আছে, তাঁহার অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই এই সময় এই সকল রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের কোন রোগ নাই কেবল দেহেই পৃথিবী ও জলের ভাগ অধিক, তাহারাও পূর্ণিমা অমাবস্যার সময় শরীর ভার, আলস্য ও অবসন্নতা অনুভব করিয়া থাকেন।

পূর্ণিমা অমাবস্যার সময় পার্থিব অবস্থার পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া আমরা আমাদের দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তনও অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি। অন্যান্য তিথিতে সামান্য পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া তাহা তত লক্ষ্য করিতে পারি না। অভ্যাস বশতঃ ঐ সামান্য পরিবর্ত্তনের অনুভবশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনুভব করিতে পারি বা না পারি প্রতি তিথিতেই শারিরীক অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যুক্তি, বিজ্ঞান, অনুমান তাহার চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তিথি বিশেষে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে যে তিথিতে যে যে বস্তু অনিষ্টকর, সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ বহু সহস্র বর্ষের গবেষণায় ও

পরীক্ষায় তাহা অবগত হইয়া তৎ তৎ দিনে তৎ তৎ বস্তুর ব্যবহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

তিথি বিশেষে বস্তু বিশেষ ভক্ষণে শারীরিক মানসিক রোগ ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় বলিয়া তাহা কাল বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এখন অনেকে মনে করিতে পারেন যে যদি ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত হয়, তবে বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য কথা বুঝাইয়া দিলেই সমাজে তাহা সাদরে গৃহীত হইত, "কুষ্মাণ্ডে ঽর্থ হানিঃস্যাৎ," "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিনী," এরূপ মিথ্যাকথার অবতারণা করিলেন কেন। আমরা বলি সত্য কথা বলিলে সকল স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, বিশেষতঃ অরণ্যে রোদন করিতে হয় সে ব্যাখ্যা অনেকেই বুঝিতে সক্ষম হয় না, বুঝিলেও সামান্য একটু শারীরিক অনিষ্ট হয় বলিয়া ও কথা হয় তো আমলেই কেহ আনে না। তাই তাঁহারা কৌশলে কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এ বিষয় মীমাংসাকার একটী সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যথা—পিব নিম্ব প্রদাস্যামি খলুতে খণ্ডলড্ডুকং।
পিত্রৈব মুক্তঃ পিবতি নতাবৎ ফল মশ্নুতে॥

কোন একটী শিশুর জ্বর হইলে চিকিৎসক তাহাকে নিমের কাথ ব্যবস্থা করিলেন। শিশু জানে যে নিমের কাথ নিতান্ত তিক্ত ও বিস্বাদ, সে তাহা কিছুতেই পান করিতে চায় না। এখন তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা কি উপায় অবলম্বন করেন।

বাবা! নিম খাও, নিম্বে এই এই জিনিসের এত ভাগ আছে, এই সকল গুণ আছে, জ্বর পিত্তময়, তিক্ত রস পিত্ত নাশক, ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে পিতা যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তবে পুত্র তাহা শোনেও না মানেও না। সুতরাং এই অবস্থায় ফল হবে না বলিয়া পিতাও সত্য পথ অবলম্বন করেন না। পিতা তখন কৌশলে কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

বাবা, নিম খাও, নিম খাইলেই তোমাকে চিনি দিব, লাড়ু দিব, ইত্যাদি প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পুত্র ঐ প্রলোভন বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নিম খায় কিন্তু "নতাবৎ ফল মশ্নুতে", সে ফল আর পায় না। অর্থাৎ পিতা যে যে বস্তু দেওয়ার কথা বলিয়া ছিলেন তাহা আর

পায় না। পিতার উদ্দেশ্য জ্বর যাওয়া, চিনি লাড়ু দেওয়া নহে, নির্ব্বোধ শিশু তা বুঝাইতে গেলেও বোঝে না।

সুতরাং পিতা কৌশলে কার্য্য সাধন করিলেন। সেইরূপ মহর্ষিগণ আমাদের পিতৃ স্থানীয়, আমরা নির্ব্বোধ বালক স্থানীয়। সকল কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝাইতে গেলে বুঝিবনা, বুঝিলেও সামান্য একটু অনিষ্ট হয় বলিয়া একেবারেই তাহা গ্রাহ্য করিব না। এই জন্য নিষিদ্ধ কার্য্যে ভয় দেখানের নিমিত্ত এক একটা গুরুতর অনিষ্ট ফল তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিয়াছেন। আবার বিধেয় কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মানের নিমিত্ত এক একটী মহা শুভ ফল তাহার সহিত যোজনা করিয়াছেন।

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভোজনে শারীরিক একটু অনিষ্ট হয়, তাহা কেহ গ্রাহ্য করিবেনা বলিয়া অর্থ হানি হয় বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থে আমাদের বড়ই মমতা, অর্থের জন্য আমরা উন্মত্ত, সুতরাং অর্থ হানির ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন।

পূঁই ভক্ষণে ব্রহ্ম বধের পাপ হয়, ইহাও ঐরূপ ভয় প্রদর্শন মাত্র।

এক পঞ্চমীব্রতে ইন্দ্রেরশচী, হরের গৌরী, মদনের রতি হওয়া যায়, এরূপ প্রলোভন ও তাহারা দেখাইয়াছেন।

এই স্তুতি ও নিন্দাগীতির নাম অর্থবাদ শাস্ত্র। ইহা কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপাদনের কৌশলবাক্য মাত্র।

স্বয়ং ব্যাস দেব বলিয়াছেন "রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ," সুতরাং কাল বিরুদ্ধ বস্তু (যাহা তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা) হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। আবার আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কৃপায় তন্ত্র মন্ত্র শাস্ত্র বাক্যাদিতে নূতন বিশ্বাস আসিতেছে, আশাকরি কিছু দিনপরে তিথি বিরুদ্ধ বস্তুর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়া পড়িবে। তখন গুপ্ত সত্য আবিষ্কৃত হইলে দেশীয় লোকের নিকট অবশ্য তাহা নত মস্তকে পরিগৃহীত হইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন
ময়মনসিংহ

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও রসায়ন।

বিবিধ বিদ্যার বিলাসভূমি ভারতবর্ষে নাই কি? সকলই আছে। "যা নাই ভারতে তা নাই জগতে" যাহা ভারতে নাই তাহা কোথা ও নাই, দেশে এই প্রবাদবাক্য প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ব, প্রাণীতত্ব, মনস্তত্ব, দেহতত্ব ইত্যাদি কত তত্বের নাম করিব? সকলেই বলিয়া আসিতেছেন এদেশে এককালে কি ছিল না? একথা আজ নূতন নহে; পুরাতন, অতিপুরাতন। ইহাই কেবল আবৃত্তি করিয়া কত কত মহাজন কালসাগরে মিলাইয়া যাইতেছেন। সকলই ছিল বুঝিলাম, কিন্তু খুঁজিলে পাই কি? আজ আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু সে বৃথা চীৎকারের আর সময় নাই। আর সেকালের কথা বলিয়া শূন্যগর্ভ দর্প করিলে চলিবে না, এখন সাধনা ও সিদ্ধির প্রয়োজন।

শুনিতে পাই পূর্ব্বসুখস্মৃতি মানবকে মহান্ করিয়া তুলে। যাঁহাদের হৃদয় মন্দিরে অতীত-বিভব-স্মৃতি ফলিত না হয়, তাঁহারা নাকি উন্নতির উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। আজ কেবল সে কথা শুনিলেও চলিবে না। তোমার পুরোভাগে অনন্ত কর্ত্তব্য নিত্য অননুষ্ঠিত রহিয়া যাইতেছে, যদি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ এবং বোঝ তবে আর দুর্ব্বলের প্রলাপোক্তি মুখে আনিয়া পুণ্য কি? এসংসার অসীম; অবাধকর্ম্মক্ষেত্র, জীবন কর্ম্মময় জ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যময়। ভীষণ আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ঘাত, প্রতিঘাত, স্থিতি এবং লয়; ইহাই সৃষ্ট জগতের অন্তর্গূঢ় অর্থ। ইহাদের মধ্যদিয়া চাই কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈচিত্র্য; আর আকর্ষণ প্রতিঘাত ও স্থিতি।

আমরা চাই এক কেন্দ্রে তিনটি আলম্বন। তিন খানা যষ্টি কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে সমস্ত ভার সহনক্ষম হয়। সে তিন খানা যষ্টি আমাদের বিশিষ্টরূপে লইতে হইবে। জগতের মুখ্য—মানবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা,—প্রাণ, অর্থ, ধর্ম্ম। প্রাণে চাই স্বাস্থ্য, অর্থে সুখ, ধর্ম্মে স্থিতি। সেই প্রাণার্থধর্ম্ম কি, কোন্ সাধনায় তাহা পাইতে পারি, কোন্ মন্ত্রে তাহাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারি, তাহাই চিন্তার বিষয়। জগৎ ইহাদের জন্যই অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমরা চাইনা অতীতের জীর্ণাস্থিপঞ্জর ; চাইনা ভবিষ্যের ভুবনবিমোহিনী কল্পিতা মূর্ত্তি ; আমাদের সম্মুখে অনন্ত মহান্ কর্ত্তব্য বিরাজমান। আমরা অতীতের অন্ধকারে যেন দিশাহারা না হই : স্মরণাতীত কালের সুখ স্মৃতিতেও যেন উন্মনা হইয়া না উঠি এবং ভবিষ্যের আকাশ কুসুম ও যেন কল্পনা করিয়া না বসি। তবে কি চাই ? চাই শুধু সম্মুখের বরাভয়-বরদ-বিগ্রহ। বর চাইতেছিনা, সুতরাং পাইতেও পারিতেছিনা। সত্য সত্যই যদি আমরা কায়মনঃপ্রাণে বরাভিলাষী হই, তবে নিশ্চয়ই কামনায় সিদ্ধি হইবে।

পরের দাবী তুমি করিও না, নিজের দাবী নিজে কর, নিজের অভাব কতটুকু দেখ, নিজের হিতেই বিশ্বহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষের যা ছিল, দেখ তাহার কতটুকুর দাবী তোমার আছে ? নিজে সঞ্চয় কর ভোগ কর এবং উত্তরাধিকারীর জন্য সযত্নে রাখিয়া দাও। গৃহের ধন বৃদ্ধিকর ; বিতরণ কর ; বাহিরের সম্পদ্ খুঁজিয়া ঘরে লও এবং সযত্নে রক্ষাকর। সাবধান কাচে কাঞ্চন ভ্রমে আপনি বঞ্চিত হইও না বা অন্যকেও বঞ্চনা করিতে যাইও না, দেখিবে আপনা আপনি দৈন্য ঘুচিয়া যাইতেছে।

সকলেই আজ অল্পপ্রাণ, অল্পধন ও অল্পধর্ম্ম, তাই আমরা প্রাণ, ধন এবং ধর্ম্ম কামী। বহুদিন আমরা আঁধারে মজিয়াছি। আজ সে আঁধার নাই সকলই দেখি, সকলই শুনি, সকলই বুঝি, কিন্তু দেহের মালিন্য কাটে নাই, জড়তায় জর্জ্জরিত ; স্ফীপ্রতার ক্ষারযোগে মালিন্য দূর করিতে হইবে, অধ্যবসায়ের অসিধারা অবসাদকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবেই ত কর্ম্মের সন্ধান, জ্ঞানের সন্ধান ও বৈচিত্র্যের বিধান করিতে সমর্থ হইব।

আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রাণকামী। ধন ও ধর্ম্মের কথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে বুঝিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণে চাই স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যে চাই দীর্ঘজীবন, দীর্ঘজীবনের সহিত চাই কর্ম্ম, জ্ঞান আর বৈচিত্র্য। সেই সুখময় জীবন পালনে কর্ম্মজ্ঞান বৈচিত্র্য কি ; তাহাই আজ সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসা। কর্ম্মেতেই জ্ঞান, জ্ঞানেই বৈচিত্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবন আছে কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম আছে ত জ্ঞান নাই, জ্ঞান থাকিলেও বিজ্ঞান কোথায় ? বিজ্ঞানেই বৈচিত্র্য এবং সুখ বিদ্যমান। কিসের ভিতর দিয়া আমরা সেই পরম পদার্থ—পুণ্য নিকেতন কর্ম্মজ্ঞান বৈচিত্র্যময় প্রাণকে লাভ করিতে পারিব তাহাই লক্ষ্য—

এই লক্ষ্য অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার বিশ্রান্তি কোথায়? লক্ষ্য—জ্ঞান বিজ্ঞান বৈচিত্র্যস্বাস্থ্যময় আয়তপ্রাণামৃতের মন্দাকিনী। যাঁহার পুণ্য-পীযুষপ্রবাহ পরম্পরায় পবিত্র হইয়া এক সময় বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ট, বাদরায়ণ, ভার্গব, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, চ্যবন, গার্গ্য, আত্রেয় মৈত্রেয় পাতঞ্জলি প্রভৃতি মহামনীষী মহর্ষিগণ জগৎকে কর্ম্মময়, জ্ঞানময় ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাঁহাদের সেই বিভব-বৈচিত্র্য আজ বিশ্বব্যাপিত। আ-ব্রহ্মাণ্ডের লোক যে অমৃতরাশি বিভাগ করিয়া লইয়া অসংখ্য পূতপ্রস্রবণ বহাইয়া দিতেছেন; আমাদের জন্য কি তাহার কণামাত্রও বিদ্যমান নাই? যদি থাকে তবে সেই কণিকাকেই কর্ম্ম-প্রবাহে ফেলাইয়া; দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় যথাকালে সর্ব্বসমন্বয়ে কেন সারোদ্ধার করিয়া লই না? আমরাও কি সেই পীযুষের পূতপ্রস্রবণ দ্বারা সনাথীকৃত হইতে পারি না? জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের খনি আয়ুর্ব্বেদের সাহায্যেই আমরা সে সমুদয় লাভ করিতে সক্ষম।

মানব—শুধু মানব কেন, প্রাণীমাত্রেই সুখান্বেষণে সতত নিরত। সেই সুখের মূল আরোগ্য। তাহার একমাত্র অন্তরায় রোগ বা দুঃখ। রোগ সমস্তই অমঙ্গলের নিদান ও প্রাণঘাতী। ঋষিগণ বলিয়াছেন ঃ—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সোজীবিতস্য চ।"

জীবনের সুখ দুঃখ বা হিতাহিত যে বিজ্ঞান দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি তাহাই আয়ুর্ব্বেদ।

হিতাহিতং সুখং দুঃখ মায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
জ্ঞানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

জন্ম মৃত্যু রহস্য।

পরলোক বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে—অর্থাৎ ইহলোকচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার কেনই বা জন্ম হইবে এবং কেনই বা জন্ম না হইবে, ইত্যাকার সংশয় অনেকেরই উপস্থিত হয়। অধুনা যে শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে অনেকেরই মত যে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না, আত্মিক দেহ ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় উপনীত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়া যায়; কাজেই মৃত্যু দুঃখের কারণ নহে, সুখেরই সোপান।

শেষোক্ত এই আত্মিকদেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জন্ম কি ও মৃত্যু কি এবং জীবন কি, অর্থাৎ জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা স্থূলতঃ সকলেরই নেত্রগোচর হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিয়া মৃত্যুর পরের অবস্থা যথাবসর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; এবং এই আলোচনাতে আমি আমার নিজের মত প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এ সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্কের পর যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব:—

"সংশয়শ্চাত্র কথং ভবিষ্যাম ইতশ্চ্যুতা নবেতি। কুতঃ পুনঃ সংশয় ইতি উচ্যতে সন্তি হ্যেকে প্রত্যক্ষপরাঃ পরোক্ষত্বাৎ পুনর্ভবস্য নাস্তিক্যমাশ্রিতা সন্তি চাগম প্রত্যয়াদেব পুনর্ভব মিচ্ছন্তি শ্রুতিভেদাচ্চ"

ইতি চরক সূত্র স্থানে ১১শ অধ্যায়।

অর্থাৎ—পূর্ব্বে যে জন্মান্তর সম্বন্ধে সংশয় বলিয়াছি, সেই সংশয় কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ পুনর্জন্ম বিষয়ে নাস্তিক্যাবলম্বন করেন অর্থাৎ পুনর্জন্মও স্বীকার করেন না, আত্মাও স্বীকার করেন না এবং আধুনিক বিজ্ঞ আত্মিকতত্ত্ববিদ্‌গণ মৃত্যুর পর প্রেত আত্মার (*Spirit*) সহিত কথোপকথন হইতে সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারা বলিতেছেন, আত্মার পুনর্জন্ম হয় না, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা স্বতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যাহা হইক মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে এইক্ষণ আলোচনা স্থগিত রাখিয়া জন্ম কি তাহাই এখন আলোচনা করিব:—

দ্বিবিধমেব খলু সর্ব্বং সচ্চাসচ্চ। তস্য চতুর্ব্বিধা পরীক্ষা—আপ্তোপদেশ প্রত্যক্ষাণুমানং যুক্তিশ্চেতি—

আপ্তাস্তাবৎ—

রজস্তমোভ্যাম্ নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞান বলেন যে
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা।

এষা পরীক্ষা নাস্তেন্যা যয়াসর্ব্বং পরীক্ষতে
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈব যয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ॥

চরকে সূত্র স্থানে ১১শ অধ্যায়।

চেতনাচেতন সমূহ বাচক সমস্ত জগৎ দ্বিবিধ যথা—সৎ ও অসৎ সদসদাত্মক জগতের পরীক্ষা বা পরীক্ষণ হেতু চারিপ্রকার যথা—

(১) আপ্তোপদেশ, (২) প্রত্যক্ষ, (৩) অনুমান, (৪) যুক্তি। যাঁহারা তপোলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভে রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; যাঁহাদের ত্রৈকালিক নির্ম্মল জ্ঞান সদা অব্যাহত থাকে; সেই তপো-যোগ-সমাধি-সিদ্ধ মহর্ষি সকলই আপ্ত শিষ্ট বা বিবুদ্ধ বলিয়া কথিত। আপ্তগণের বাক্য নির্ভীক, তাঁহারা সর্ব্বদা সত্য কহেন, কারণ রজ স্তম শূন্য বলিয়াই মিথ্যা বলেন না।

প্রত্যক্ষ—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ার্থ ইহাদের সংযোগে তৎকালে যে বুদ্ধি ব্যক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়।

অনুমান। যাহা প্রত্যক্ষ পূর্ব্ব তাহাই অনুমান। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমান সম্ভবপর নহে। অনুমান ত্রিবিধ যথা—কারণ অনুমান, কার্য্যানুমান ও সামান্য দৃষ্টানুমান। ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই প্রত্যক্ষ পূর্ব্ব অনুমেয় হয়। ধূম দ্বারা বর্ত্তমান নিগূঢ় বহ্নির অনুমান হয়। গর্ভ দর্শনে অতীত মৈথুনের অনুমান হয় বীজ দর্শনে ভবিষ্যত ফলের অনুমান হয়। এবং আম্রাদি যে বীজ হইতে যেরূপ ফল জন্মিয়াছে, সেই বীজ হইতে সেইরূপ ফল জন্মিবে, ইহা অনুমান হইয়া থাকে। যেমন জল, ভূমি কর্ষণ, বীজ এবং ঋতু ইহাদের সংযোগে শস্যের উদ্ভব হয়, যেমন ষড় ধাতুর সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হয়। যেমন মথ্য ও মন্থন ভাবাপন্ন অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের মন্থনে অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ভিষগাদি পাদ চতুষ্টয় যুক্তিযুক্ত হইলে ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যুক্তি—যে বুদ্ধি অবিজ্ঞাত বিষয়ের প্রকৃততত্ত্ব অবগতির জন্য বহুবিধ কারণ জাত বিষয় সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করে সেই বুদ্ধির নাম যুক্তি। ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক বিষয়ের আলোচনানুসারে যুক্তিও ত্রৈকালিক এবং ইহা দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধিত হইয়া থাকে।

আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি এই চারিটীকে পরীক্ষা কহে—ইহা ব্যতীত অন্য কোন পরীক্ষা নাই। ইহা দ্বারা সৎ অসৎ যাবতীয় বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং এই পরীক্ষা দ্বারাই জানা যায় যে পুনর্জন্ম আছে।

জন্ম কারণ সম্বন্ধে মতভেদ।

মাতরং পিতরঞ্চৈব মন্যন্তে জন্মকারণং
স্বভাবং পরনির্ম্মাণং যদৃচ্ছাঞ্চাপরেজনা:
ইত্যতঃ সংশয়ঃ কিং ধন্বস্তি পুনর্ভব নবেতি। ক্রমশঃ

শ্রীরাধিকামোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন সরস্বতী।

অস্ত্র-প্রয়োগের পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার

সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ।

অস্ত্র-চিকিৎসার ফল দর্শন করিয়া আজকাল সভ্য-জগতের সকলেই চমৎকৃত হইতেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা জগতের একটী নূতন আবিষ্কার। কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহাই আমরা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। এই শাস্ত্র এই পবিত্র ভারতভূমিতে বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই শাস্ত্রানুযায়ী চিকিৎসা একেবারে লোপ পাইয়াছে। ৺ মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত যদি তদীয় ইতিহাসে আর্য্যগণের অস্ত্র চিকিৎসার কথা না লিখিতেন, তবে ভারতবর্ষে এই শাস্ত্র যে প্রবর্ত্তিত ছিল, এ কথা বলিলে লোকের নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হইতে হইত; হয়ত লোকে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। সেই স্বর্গীয় মহাত্মা তাঁহার প্রণীত ভারতের ইতিহাসে বলিয়াছেন—"In surgery no less than 127

surgical instruments are described, and the instruments, we are told, should be bright, polished, and sharp, sufficiently so "to divide a hair longitudinally. Dissection was largely practised, and many operations, which are considered hazardous to this day, were undertaken." —"অস্ত্র-চিকিৎসাশাস্ত্রে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অস্ত্র সমুদয় এত উজ্জ্বল, মসৃণ এবং তীক্ষ্ণ ছিল যে তদ্দ্বারা কেশাগ্রও লম্বালম্বিভাবে ছেদন করা যাইত। শবব্যবচ্ছেদ প্রথাও বিশেষ প্রচলিত ছিল; যে সমুদয় অস্ত্রকার্য্য আজকাল সঙ্কটাপন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎকালে তাহাও সম্পাদিত হইত।" পূর্ব্বোক্ত পঙ্‌ক্তি কতিপয়ে জানা যায় যে, এই শাস্ত্র এই পুণ্য ভারতভূমিতে বহু দিবস পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ যে কেবল অস্ত্র ব্যবহারে পটু ছিলেন, তাহা নহে; অস্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে কি কি নিয়ম প্রতি-পালন করা প্রয়োজনীয়, এবং কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহাও তাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। আমরা তাহাও প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাকালে নিজ নিজ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দেবতারা সর্ব্বদাই অসুরদের সহিত যুদ্ধে অনবরত লিপ্ত ছিলেন, সেই সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র প্রহরণ জনিত ক্ষত ও রক্তপাত সর্ব্বদাই হইত। তৎপ্রতিষেধার্থে দেবাসুরগণ নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যথা:—

দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য
স্নায়ুস্থি ভগ্নানসুরৈঃ সুরাংশ্চঃ।
নারায়ণেনাপি সুবৃংহনর্থম্
স্বনাম তৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অস্ত্র চিকিৎসা বহু পূর্ব্বতন।

তৎপর ক্ষত্রিয়েরা সংগ্রামে আহত ব্যক্তির শরীর হইতে সুতীক্ষ্ণ বাণ অনায়াসে অজ্ঞাতসারে অপসরণ জন্য ও ক্ষতাদি ধৌত করণার্থ ও রোগীর তীব্র বেদনা দূরীকরণার্থ এমন সব অবসাদক দ্রব্য ব্যবহার ও প্রক্রিয়া করি-তেন, যৎ দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইত এবং

রোগীরও কোন প্রকার কষ্টই অনুভব হইত না। রোগীর সাময়িক মোহ উৎপাদন নিমিত্ত তাঁহারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেন। মাতৃকা-নাম্নী ধমনীতে (Carotid arteries) অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে মস্তিষ্কে অল্প শোণিত প্রবাহ দরুণ এক প্রকার মোহ উপস্থিত হয়, ইহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। তাহারা এই উপায় অবলম্বনে রোগীকে মোহাভিভূত করিয়া তাঁহাদের উপর অস্ত্রোপচার করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মাতৃকাধমনী গ্রীক-রোমিও ভাষাতে উল্লিখিত কারণহেতু "নিদ্রার ধমনী—the artery of Sleep" বলিয়া অভিহিত হয়। তৎপর তাহারা আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অবসাদ জন্মাইবার জন্য রোগীকে মাদক-দ্রব্য-সেবন করাইতেন। যথা :—

প্রাক্ শস্ত্রকর্ম্মনশ্চেষ্টং ভোজয়েদাতুরং ভিষক্।
মদ্যপং পায়য়েন্মদ্যং তীক্ষ্ণ যো বেদনাসহঃ॥
ন মূর্চ্ছত্যন্ন সংযোগান্মত্তঃ শাস্ত্রং ন বুধ্যতে।
তস্মাদবশ্যং ভোক্তব্যং রোগেষূক্তেষু কর্ম্মণি॥

রোগীর বেদনা সহ্য না হইলে শস্ত্র কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে বৈদ্য তাহাকে অভিলষিতরূপ ভোজন করাইবেন। আর রোগীর যদি মদ্যপান অভ্যাস থাকে, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্যপান করাইবেন, তাহা হইলে সে অস্ত্রের যাতনা অনুভব করিতে পারিবে না, রোগীকে অন্ন ভোজন করাইয়া অস্ত্র করিলে তাহার মূর্চ্ছা হয় না। আর মদমত্ত ব্যক্তিরও শস্ত্র ক্লেশ অনুভূত হয় না; অতএব শস্ত্রক্রিয়া আবশ্যক হইলে অবশ্য ভোজন করাইবে। মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং গবেষণার ফলে দুই অভূতপূর্ব্ব মাদক দ্রব্য "সুরাসব" ও "মধ্বাসব" আবিষ্কৃত হইল। এই মাদক দ্রব্য সেবনে রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইলে তাহাদের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করিতেন। তাহার পর তাঁহারা আরও একটু উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা মোহাভিভূত করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরিক ক্রিয়া প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহারা অগ্নিতে গাঁজার ন্যায় একরূপ মাদক দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেন যাহা ধুমায়িত হইলে এবং সেইধুম নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে রোগী আপন হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়িত।

এই অবসাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করিতেন।

এই প্রকারে সাময়িক মোহ উৎপাদন জন্য তাঁহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিতেন তাহার অনেক ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। পণ্ডিত বালালা বলেন,—'খ্রীষ্ট জন্মের ৯৭৭ বৎসর পূর্ব্বে ভোজরাজ যখন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা চিকিৎসার জন্য ধররাজ্য হইতে দুইজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে আহ্বান করা হয়। তাঁহারা রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সাংঘাতিক অস্ত্রেপ্রয়াগ ব্যতীত ভোজরাজার অব্যাহতি নাই। তদন্তর তাঁহারা রাজাকে "সম্মোহনী নামক" (Sammohini) ঔষধ প্রয়োগে বিলুপ্ত-সংজ্ঞ করিয়া অচেতন অবস্থায় তাহার মাথার খুলি কাটিয়া (Trephining) মস্তিষ্কের বিকৃতাংশ অপসারণ পূর্ব্বক মাথার খুলি পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, সেলাই-করতঃ, পচন নিবারক (Anteseptic) ঔষধ প্রয়োগান্তর বন্ধন (Bandage) করিয়াছিলেন। এই অস্ত্র প্রয়োগের পর রাজার সংজ্ঞা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা নিবারণার্থ সঞ্জীবন নামক (Sanjivini) এক ঔষধ প্রয়োগ করিলেন'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।



আয়ুর্ব্বেদ-তত্ত্ব।

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা॥
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধা স্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মান্নাসত্যং নীরজস্তমাঃ॥

চরকঃ।

যাঁহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন—যাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের বিষয় বিশেষরূপে

জানিতে সক্ষম, যাঁহাদের জ্ঞান সদাই সর্ব্ব বিষয়ে ব্যাঘাতশূন্য সেই তপো-যোগসিদ্ধ মহর্ষিগণই শিষ্ট, বিবুদ্ধ ও আপ্তপুরুষ। তাঁহাদিগের বাক্যে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তাঁহারা সত্য ব্যতীত কখনই মিথ্যা বলেন না—কারণ তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের অতীত হইয়াছেন। এই সকল আপ্তপুরুষের উপদেশকে আপ্তোপদেশ বলে।

বেদকে আপ্তাগম বলে। বেদ ব্যতীত শিষ্ট সম্মত, বেদের অবিরোধী ও সর্ব্বলোকের হিতকামনায় ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সকল শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হই-য়াছে তাহাদিগকেও আপ্তাগম বলে।

বেদ চতুর্ব্বিধ। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব। এই বেদ চতুষ্টয়ের সারাংশ হইতেই মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রোক্ত চতুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদের মূল হইলেও আয়ুর্ব্বেদ যে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ, ইহা ধন্বন্তরি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযুক্ত অবস্থাকে আয়ুঃ বলে। যে শাস্ত্রে আয়ুঃসম্বন্ধীয় হিতাহিত বিচার, রোগ-সমূহের নিদান ও শান্তির উপায় ব্যক্ত আছে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে।

এই আয়ুর্ব্বেদের মূল সূত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ। ইহারা ধাতু সকলকে ও মল পদার্থদিগকে দূষিত করে বলিয়া দোষ নামে অভিহিত। ইহাদের দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু বলে এবং ইহারা রসাদি পদার্থকে মলিন করে বলিয়া মল নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ইহারা বিকৃত ও অবিকৃত থাকিয়া যথাক্রমে দেহকে বর্দ্ধিত করে। উহারা সর্ব্বব্যাপী হইলেও হৃন্নাভির অধঃ, মধ্য ও উর্দ্ধদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। ধাতু, মল ও দোষ সংজ্ঞাত্মক বায়ু-পিত্ত-কফ-বয়স-দিবা-রাত্রি ও ভোজনের অন্ত, মধ্য ও আদিতে যথাক্রমে বর্দ্ধিত-বল হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুতগ্রন্থ ও "আপ্তাগম"। এই গ্রন্থে মানব-দেহে শুক্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মত দেখা যায়। এক মতে—

"রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥"

আহার্য্য দ্রব্য সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে তেজো-ভূত পরমসূক্ষ্ম যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলে। এই

রসের সারাংশ হইতে রক্ত, রক্তের সারাংশ হইতে মাংস, মাংসের সারাংশ হইতে মেদ, মেদের সারাংশ হইতে অস্থি, অস্থির সারাংশ হইতে মজ্জা এবং মজ্জার সারাংশ হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। অন্য মতে—

"মাসেন রসঃ শুক্রো ভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি"

উক্তরস একমাসে পুরুষদিগের শুক্র এবং স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত একবার বলিলেন "মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়" আবার বলিলেন, "রস হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়।" ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই সন্দেহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে নিম্নে আহারাদির যে প্রকার গতি ও পরিণতি অবস্থা হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

মহর্ষি চরক "নাভি ও স্তনের মধ্য স্থানকে আমাশয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" এবং "নাভি হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং কণ্ঠ হইতে ছয় অঙ্গুলি নিম্ন যে স্থান, তাহাকে উরঃ (রক্তাশয়) এবং অবশিষ্ট ভাগকে হৃদয় (শ্লেষ্মাশয়) বলিয়া গিয়াছেন। শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়, আমাশয়ের নিম্নে অগ্ন্যাশয় (পাচকাশয় বা গ্রহণী), অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পক্কাশয় বা মলাশয় এবং মলাশয়ের নিম্নে বস্তি (মূত্রাশয়) অবস্থিত আছে। হৃদয়ে অবস্থিত দেহ-ধারণকারী প্রাণ নামক বায়ু মুখে গমন করতঃ মুখগত আহারীয় দ্রব্যকে আমাশয়ে প্রেরণ করে। আমাশয়ে নীত ভুক্ত দ্রব্য সমূহকে আমাশয়স্থ ক্লেদন নামক কফ আর্দ্র করে। ভুক্ত দ্রব্য মধুর রস কফের সংযোগে মধুর রস হয়। আমাশয়স্থ সেই আহার পরে নাভিমণ্ডলস্থ সমান বায়ু কর্ত্তৃক পাচকাশয়ে প্রেরিত হয়। উক্ত আহার তথায় তত্রস্থ পাচকাখ্য পিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা পরিপাক হয়। পচ্যমান আহার কটুরস পিত্ত সংযোগে কটু হইয়া থাকে।

মানব শরীর যেমন পাঞ্চভৌতিক, আহারও তদ্রূপ পাঞ্চভৌতিক। জন্মজ পঞ্চভূতে পঞ্চ প্রকার অগ্নি অবস্থান করে। যথা:—ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস। ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় পার্থিবাদি পঞ্চ আহার-গুণকে পরিপাক করে। এইরূপে আহারের জলাদিভাগ পরিপাক প্রাপ্তি হয়। পাচকাশয়স্থ উক্ত বিপক্ক আহারের সার ভাগকে রস ও অসার ভাগকে মলদ্রব কহে। মলদ্রবের জলভাগ ও অবশিষ্ট ভাগ নাভিমণ্ডলস্থ ব্যান বায়ু

কর্ত্তৃক যথাক্রমে শিরামার্গ দ্বারা বস্তিতে ও মলাশয়ে নীত হইয়া মূত্রত্ব ও পুরীষত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক উহারা যথান্বয়ে লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

পাচকাশয়স্থ সারভাগ রস সমানবায়ু কর্ত্তৃক ধমনীমার্গ দ্বারা প্রেরিত হইয়া রসধাতুর স্থান হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ রসের সহিত মিলিত হয়। এবং উক্ত রস তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থান পূর্ব্বক তত্রস্থ রস-ধাতুর অগ্নিদ্বারা আহারজাত রস পরিপাক হইয়া থাকে।

রসধাতুর অর্থ গমন করা, সুতরাং অহরহঃ গমন করে বলিয়া উহার নাম রস। সাধারণতঃ রস, আদিরসধা তু হইতে মজ্জা ধাতু পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানে ক্রমে ক্রমে গমন পূর্ব্বক সেই সেই ধাতুতে পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিতি করে। উক্ত রস পচ্যমান অবস্থায় প্রত্যেক ধাতুতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও মল এই তিন রূপে বিভক্ত হয়। স্থূলভাগ স্বকীয় ধাতুতে অবস্থান করে, সূক্ষ্মভাগ যথা-ক্রমে পরবর্ত্তী ধাতুতে গমন করে এবং মলভাগ তন্মলে যায়।

রসের মলভাগ ঃ—রসধাতুর অগ্নিদ্বারা পচ্যমান আহারজাত রস হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহার নাম মলকফ। এই কফ হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ধমনীমার্গদ্বারা আমাশয়স্থ ক্লেদনাখ্য কফে প্রেরিত হইয়া তাহাকে পোষণ করে। পরে পরিপক্ক সারবান্ রস স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়।

রসের স্থূলভাগ ঃ—সারভূত রসের স্থূলভাগ রসধাতুকে পরিপুষ্ট করে এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া স্নেহাদি গুণে সমস্ত শরীরের পুষ্টি জন্মাইয়া থাকে।

রসের সূক্ষ্মভাগ ঃ—সারভূত রসের সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক ধমনীপথে প্রেরিত হইয়া রক্তেরস্থান যকৃৎ ও প্লীহায় গমন পূর্ব্বক তত্রস্থ রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং উহা তথায় পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল অব-স্থিতি করিয়া রঞ্জক নামক পিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা রক্তীকৃত হয়।

রক্তের মলভাগ ঃ—রক্তাগ্নিতে পচ্যমান প্রোক্ত সূক্ষ্মভাগ হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাই মলপিত্ত। এই পিত্ত নাভিমণ্ডলস্থ সমান বায়ু কর্ত্তৃক ধমনীপথে প্রেরিত হইয়া পাচকাশয়স্থ পাচকাখ্য পিত্তে যুক্ত হইয়া

তাহাকে পোষণ করে। পরে পরিপক্ক সারবান্ শোণিত স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই-ভাগে বিভক্ত।

রসের স্থূলভাগঃ—সারভূত রক্তের স্থূলভাগ যকৃৎপ্লীহাস্থ রঞ্জ-কাখ্য পিত্তদ্বারা রঞ্জীকৃত হইয়া রক্তধাতুকে এবং সর্ব্বশরীরগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক ধমনীপথে প্রেরিত হইয়া সমস্ত শরীরগত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে।

রসের সূক্ষ্মভাগঃ—সারভূত রক্তের সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক ধমনী ও শিরাপথে প্রেরিত হইয়া স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পক্ব এবং বায়ুদ্বারা ঘনী-ভূত হয়; পরে মাংস ধাতুতে মিলিত হয় এবং তথায় উহা পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল সঞ্চরণ করিয়া মাংসাগ্নি দ্বারা পরিপাক হয়।

মাংসের মলভাগঃ—মাংসাগ্নিতে পচ্যমান প্রোক্ত সূক্ষ্মভাগ হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক কর্ণদ্বয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহাতে মলরূপে পরিণত হয়। পরে পরিপক্ক সারবান মাংস স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাগে বিভক্ত হয়।

মাংসের স্থূলভাগঃ—সারভূত মাংসের স্থূলভাগ শরীরস্থ মাংস-ধাতুকে পোষণ করে।

মাংসের সূক্ষ্মভাগঃ—সারভূত মাংসের সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু শিরা ও ধমনীপথে প্রেরিত হইয়া মেদাধার উদরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ মেদের সহিত মিলিত হয় এবং উহা তথায় পাঁচদিন দেড় দণ্ডকাল থাকিয়া মেদধাতুর অগ্নিদ্বারা পরিপক্ব হয়।

(১) **মেদের মলভাগ**ঃ—মেদধাতুর অগ্নিতে পচ্যমান প্রোক্ত সূক্ষ্মভাগ হইতে যে, মল নির্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ বা ঘর্ম্ম। এই ঘর্ম্ম শরীরোষ্মা দ্বারা উত্তপ্ত হইলে ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। প্রোক্ত ঘর্ম্মমল শীতল পদার্থ। উক্তাবস্থায় ইহা শিরা স্রোত মধ্যেই অবস্থিতি করে। পরে পরিপক্ক সারবান্ মেদ স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

(২) **মেদের স্থূলভাগ**ঃ—সারভূত মেদের স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদধাতুকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক স্রোতপথে প্রেরিত হইয়া সূক্ষ্মাস্থি স্থিত মেদের ও পোষণ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কবীন্দ্র।

স্বাস্থ্য বিবেক।

স্বাস্থ্যই জীবনের সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতে মনুষ্য মাত্রেরই বাসনা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমরা দিন ২ ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্প আয়ু হইয়া পড়িতেছি। এই হীনতার মাত্রা এতদূর নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে আসিয়া পড়িয়াছে যে শত বৎসর পূর্ব্বের শক্তি ও সামর্থ্যের কার্য্যাদির বিষয় শুনিয়া নিতান্ত কল্পনা মূলক উপাখ্যান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের এই হীনতার প্রধান কারণ, প্রাচীন রীতি নীতি প্রতি উদাসীনতা এবং পাশ্চাত্য রীতি নীতির অনুকরণ। আমরা দিন ২ যতই আর্য্য আচার পরিভ্রষ্ট হইতেছি ততই হীনস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি। একবারও বিবেচনা করিয়া দেখিতেছিনা যে, আমাদের দেশ ভিন্ন, জল বায়ু ভিন্ন, প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুপর্য্যায় প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য রীতি নীতির অনুকরণ কেন আমাদের স্বাস্থ্য উপযোগী হইবে? সহজে অনুমিত হয় যে, শীতকালে যেরূপ আহার সহ্য করা যায় গ্রীষ্মকালে তাদৃশ আহার সহ্য করা দূরের কথা বরং পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। আমরা সভ্যতার মোহে পড়িয়া প্রচণ্ড নিদাঘ সন্তাপেও উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া অসহনীয় কষ্ট নীরবে সহ্য করি এবং মনে ২ সভ্যতার গৌরব অনুভব করি। যেমন পিত্তদ্বারা রসনা পীড়িত হইলে শর্করাও তিক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়, আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমাদের ও তাহাই ঘটিয়াছে। দেশীয় সদ্বস্তু, সৎশিক্ষা, সদুপদেশ, আর আমাদের সৎ বলিয়া মনে ধারনা হয় না। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দু আচার ব্যবহার সমুদয়ের প্রতিই অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষাচরিত নিয়ম সমূহ যে এদেশীয় জল বায়ুর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা আজকাল অনেক পাশ্চাত্য শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ও স্বীকার করিতেছেন। আমরাও এরূপ অনেক দেখিতে পাই যাঁহারা প্রত্যহ পিতা, পিতামহ প্রভৃতির আচরিত নিয়মে আহার বিহারাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষিগণের প্রচারিত বিধি সমূহ যে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তি

বর্গের স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান উপায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমরা স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও আচরণীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি সমূহ ক্রমে বিবৃত করিতেছি।

এখন কথা হইতেছে 'স্বাস্থ্য" কাহাকে বলে। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সম ধাতু মল ক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ সুস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
(উত্তর তন্ত্র সুস্থ বৃত্ত অধ্যায়)

যাহার শরীরে দোষ (বায়ু পিত্ত কফ) সমূহের সমতা (প্রকৃতিস্থ) অগ্নির সমতা এবং ধাতু (রস রক্তাদি) ও মলাদির (মল মূত্রাদির) ক্রিয়ার সমতা আছে, অথচ যাহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা আছে তাহাকে সুস্থ বলা যায়। বিশুদ্ধ আহার বিহারই স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়। অতএব আমরা প্রথমতঃ আহার বিধিই বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাণী মাত্রই আহার (পান, ভোজনাদি দ্বারা স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহারই প্রাণীদিগের বল, বর্ণ ও ওজো ধাতুর মূল। আবার তাহার বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে কথিত আছে বাহ্যাগ্নি যেরূপ বাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির আহারীয় সামগ্রী অভাবে শরীরিক পাচকাগ্নি ও হীন হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তদভাবে কফাদি দোষ সমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতু সমূহকে এবং ধাতু পরিপাকান্তে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বুভুক্ষিতো ন যোঽশ্নাতি তস্যাহারেন্ধনক্ষয়াৎ।
মন্দীভবতি কায়াগ্নির্যথা চাগ্নি র্নিরীন্ধনঃ॥
আহারং পচতি শিখী দোষানাহার বর্জিতঃ।
দোষানাং ক্ষয়েচ ধাতূন্ প্রাণান্ ধাতুক্ষয়ে পচেৎ॥
(ভাব প্রকাশ পূর্ব্ব খণ্ড)

অতএব পূর্ব্বকৃত আহার সম্যক্ জীর্ণ হইলেই পুনরায় আহার করিবে।

পরিমিত ও অপরিমিত ভেদে আহার দুই প্রকার। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভোজন করিলে তাহা তাহার প্রকৃতির ব্যাঘাত না করিয়া যথাকালে

পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণ ভোজনই তাহার পরিমিত ভোজন বলিয়া জানিবে। পরিমিত আহার দ্বারা কুক্ষির কোনরূপ পীড়া হয় না, পার্শ্ব-দেশে কোন ক্লেশ বোধ হয় না, হৃদয় পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়, উদর লঘু বোধ হয়, ইন্দ্রিয় সমুদয় সবল হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি হয়, শয়ন উপবেশন গমন এবং হাস্যাদি করিতে কোন ক্লেশ হয় না, প্রাতঃ ও সায়ং কালে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইয়া ক্ষুধা জন্মে বল বর্ণ ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। আর যেরূপ আহার দ্বারা প্রকৃতির ব্যাঘাত জন্মে তাহাকে অপরিমিত আহার বলিয়া জানিবে। আবার অপরিমিত আহার দুই প্রকার, হীন মাত্রা ও অধিক মাত্রা। তন্মধ্যে হীনমাত্রায় আহার করিলে বল, বর্ণ ও শারীরিক বৃদ্ধির ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, আহারে তৃপ্তি জন্মেনা আয়ু হ্রাসকর হয়, ওজো ধাতুর ক্ষয় কারক হয়, মল বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাশক, শ্রীভ্রংশ-কর ও অবৃষ্য হইয়া থাকে।

অতি মাত্রায় আহার করিলে দোষ সমূহ কুপিত হয়, এবং তজ্জনিত সকল প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে। অর্থাৎ বায়ু কুপিত হইয়া উদরে শূল আনাহ, (মল মূত্র বদ্ধতা) অঙ্গমর্দ্দ, মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পাচকাগ্নির বৈষম্য শিরা সঙ্কোচন, স্তম্ভা, প্রভৃতি রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর অতীসার অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম, প্রলাপ প্রভৃতি উৎপাদন করে। কফ কুপিত হইয়া সর্দ্দি অরোচক, অগ্নিমান্দ্য শীতজ্বর, আলস্য ও গাত্র গৌরব প্রভৃতি উৎপাদন করে।

উল্লিখিত হীন অতি মাত্রায় আহারই যে কেবল বিবিধ রোগোৎপাদন করে এমন নহে, পরন্তু গুরু, শীতল, শুষ্ক, বিদ্বেষজনক, বিষ্টম্ভি, বিদাহি, অশুচি, সংযোগবিরুদ্ধ, অসময়ে ভুক্ত যে অন্ন, পান, এবং কাম, ক্রোধ, মোহ, ঈর্ষ্যা, লজ্জা, শোক, লোভ, উদ্বেগ, এবং ভয়াদি দ্বারা অভিহিত চিত্ত ব্যক্তির যে আহার তাহাও দোষ সমূহের বৈষম্য জন্মাইয়া বিবিধ রোগোৎ পাদন করিয়া থাকে। অতএব এ সমস্ত দোষাবহ আহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে।

পূর্ব্বকৃত আহার সম্যক জীর্ণ হইলে পুনরায় আহার করা কর্ত্তব্য। ধূম ও অম্লাদি রহিত উদ্গার শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াতে অধ্য-

বসায়, উপযুক্তরূপ মল মূত্রাদির বেগ ও উৎসর্জ্জন, শরীরের লঘুত্ব, এবং ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক, এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে বুঝিবে যে ভক্ষিত দ্রব্য সকল জীর্ণ হইয়াছে।

কখন কখন মল আম (অপক্ক অন্নরস) দোষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অগ্নির এক পার্শ্বে লীন হইয়া থাকে, অথচ তাহা অগ্নির পথ আবৃত না করাতে অজীর্ণ সত্ত্বেও ক্ষুধা বোধ হয়। এরূপ দুষ্ট ক্ষুধায় আহার করিলে সেই আহার বিষবৎ প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। অতএব ব্যক্তি মাত্রেরই পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ হইলে পুনরায় আহার করা কর্ত্তব্য। কারণ ভক্ষিত দ্রব্য সকল সম্যক জীর্ণ না হইতে ভোজন করিলে পূর্ব্ব ভুক্ত দ্রব্যজাত অপক্করস পরকৃত আহারীয় রসের সহিত মিলিত হইয়া দূষিত হয় এবং বাতাদি দোষ সমূহকে কুপিত করিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে।

কালাদি (প্রাতঃ ও সায়ং কালাদি) বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। অর্থাৎ প্রাতঃকালে (এক প্রহর বেলার উর্দ্ধে ও দ্বিপ্রহর বেলার মধ্যে) ও সায়ংকালে (এক প্রহর রাত্রির উর্দ্ধে ও দ্বিপ্রহর রাত্রির মধ্যে) ভোজন করিবে। কেননা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি হয় এবং দ্বিপ্রহর অতীত করিয়া ভোজন করিলে বীর্য্যক্ষয় হয়। কেহ কেহ বলেন যথাকালেই হউক অথবা অসময়েই হউক রস, দোষ, ও মলের পরিপাক হইয়া যৎকালে ক্ষুধা অনুভব করিবে তখনই আহার করিবার উপযুক্ত কাল।

যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং, যাম যুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যাম মধ্যে রসোৎপত্তি' র্য্যাম যুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ॥
ক্ষুৎসম্ভবতি পক্কেষু' রস দোষ মলেষুচ।
কালে বা যদিবাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥
(ভাব প্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

অহিত আহার তিন প্রকার, যথা—বিষমাশন, সমশন, ও অধ্যশন। যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অসময়ে অধিক কিম্বা অল্প মাত্রায় আহার করিলে সেই আহারকে বিষমাশন কহে। হিতাহিত দ্রব্য একত্র

ভোজন করিলে সমশন কহে! অজীর্ণে ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। এই ত্রিবিধ ভোজনই প্রাণহানীকর হয় ও বহুব্যাধি উৎপাদন করে।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

চিকিৎসা-সংবাদ।

মৌমাছির হুলের উপকারিতা।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত চিকিৎসা-তত্ত্ব জ্ঞাপক পত্রিকা "লানসেট্" বাতরোগের জন্য মধুমক্ষিকার হুলের উপকারিতার কতক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। জনৈক চিকিৎসক উহাতে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করেন ঃ—

একব্যক্তি বহুকাল স্থায়ী গ্রন্থিপ্রদাহের জন্য ৫৫ বত্রসর বয়ঃক্রমের সময় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন : লোকটি পঙ্গু হইয়া যায়, এবং বক্ষস্থলের উপর উহার চিবুক ঝুঁকিয়া পড়ে। সপ্তাহে ঐ ব্যক্তির শরীরে আঠার বার হুল ফুটান হইত ; দুই মাসের মধ্যে রোগী মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকিতে সমর্থ হইল এবং গ্রন্থির ব্যথা প্রায় তিরোহিত হইয়াগেল।

অন্য এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতিবারে ৬। ৭ মাস করিয়া ভুগিত ; মক্ষিকার হুল প্রয়োগে সে একেবারে নিরাময় হইয়া উঠিল।

ম্যালেরিয়া কীটাণু নাশে মৎস্যের ক্ষমতা!

খনি ও ভূতত্ত্ব সমিতির সভাপতি মিঃ আর, পি, অ্যাশটনের বিগত ২৭শে জানুয়ারীর বক্তৃতার পরিশিষ্ট ভাগে যে সকল ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য মশকের অন্ত নির্ম্মুক্ত কীট সংহার করে তাহাদের সম্বন্ধে একটি অত্যাবশ্যকীয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সন্নিবিষ্ট আছে। কলিকাতা পশু-বাটিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বি বসু উক্ত মন্তব্যের লিখক। তিনি বলেন যে বিগত ১৯০৯ সনের ১৩ই নবেম্বর তারিখে যুক্তপ্রদেশের স্বাস্থ্য-হিত বৈঠকের উপরোধে মেজর স্যালবি "মিলিয়েন্‌স্" নামে পরিচিত মশকের অন্ত-নির্ম্মুক্ত কীটভুক্ এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্যের চালান ভারতবর্ষে

আনয়ন করেন; উল্লিখিত মৎস্যই নাকি "বারবেডোজ" দেশকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কলিকাতা পশুশালার সরীসৃপ গৃহে অবস্থিত এক প্রকাণ্ড কাঁচের কুণ্ডে উহারা রক্ষিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত উহাদের তিনবার অণ্ড প্রসব হইয়াছে; উহারা কষ্টসহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অধিক বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। বন্ধু মহাশয় আরও বলেন :—

এই বিদেশীয় মৎস্যের উপস্থিতির পূর্ব্বে আমি আমাদের বাগানের জল কুণ্ড সমূহে এতদ্দেশের তেচোখো মাছের উল্লিখিত মশককীট সংহারে স্বভাব আছে কিনা সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম। "মিলিয়েন্স" আসার পর উহাদের জলকুণ্ডের পার্শ্বে আমি অন্য একটি বড় জলকুণ্ড রাখিয়া তাহাতে আমাদের "তেচোখো" মাছের একদল ছাড়িয়া দেই; পরে সমান ভাগ মশককীট উভয় কুণ্ডে ফেলিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত বিদেশীয় মৎস্য অপেক্ষা আমাদের দেশের মাছগুলি কোনোও অংশেই আমাদের শত্রুনিপাতে কম পটু নহে। তবে দেশের মাছগুলির দোষ এই যে উহারা ,পরুষ-স্পর্শ সহ্য করিতে সক্ষম নহে; কিন্তু পুকুরে মুক্ত অবস্থায়:উহারা বেশ থাকে।

ইতঃপূর্ব্বে পশুশালার উদ্যানস্থ পুকুর ও ডোবাগুলি মশক উৎপাদনের বিস্তৃত স্থানমধ্যে পরিগণিত হইত; কিন্তু এই মাছগুলি ছাড়িয়া দেওয়ার পর হইতে উক্ত জলাধার সকল প্রায় মশক বিরহিত হইয়া পড়িয়াছে।

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা—রেঙ্গুনের ডাক্তার মেজর রোষ্ট আই; এম, এস্ ও বোম্বাইর ডাক্তার কাপ্তান উলিয়াম্‌স্ আই, এম, এস্ কুষ্ঠরোগের তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; ডাঃ রেষ্ট ৭ বৎসর অনুসন্ধানের পর কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং এই জীবাণু পোষণ করিয়া তাহার সার কুষ্ঠ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন; তিনি ১০টি রোগী চিকিৎসা করেন; ৭ জনের শরীরে এই পদার্থ প্রবেশ করান হয়; ২ জন রোগ-মুক্ত হইয়াছে; ২ জনের সামান্য রোগ আছে; আর ৬ জনের রোগ হ্রাস হইয়াছে। ডাঃ উইলিয়াম্‌স্ ও এক প্রকার জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা মেজর রোষ্টের আবিষ্কৃত জীবাণুরই অনুরূপ। ডাঃ লুকিস্ ইঁহাদের রিপোর্ট পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহারা যথার্থই কুষ্ঠ রোগের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।